জীবন তৃষ্ণা

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

ক'দিন যাবৎ ঠান্ডা আবহাওয়া। ভোরের দিকে শীততাপ নিয়ন্ত্রণে ভরে থাকে সারাঘর। উঠতেই ইচ্ছে করেনা বিছানা ছেড়ে। আর লং-উইকেন্ড্ হলে তো কথাই নেই! রাতভোর পালা করে চলে কাব্য জলসা কিংবা সহেলিদের লাস্যভরা নৃত্যগীতের আসর! তারপর বিছানায় গেলে সকালে ঘুমই ভাঙ্গতে চায়না আর সহজে!

এমনি এক ভোর রাত্রিরে কখন যে নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে কুম্ভকর্ণের মতো বেহুঁশ হয়ে পড়লাম, টেরই পেলাম না! ইতিমধ্যে খট্খট্ শব্দে নড়ে ওঠে দরজার কড়া। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম ভেবে তন্দ্রাজড়ানো চোখে লাফ দিয়ে উঠি! জানালা দিয়ে দেখি, তখনও শূন্য নিবিড়, আবছা অন্ধকার বাইরে। কুয়াশাচ্ছন্ন চারদিক। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছেনা কিছু! রাস্তার বিজলীবাতিগুলিও নিভু নিভু প্রায়! রাজ্যের পশু-পক্ষীরাও সব নিদ্রায় মগ্ন! নিঝুম, নিস্তব্ধ! ঘড়ির কাঁটা চলছে হৃদস্পন্দনের মতো টিক্টিক্ শব্দে! যেন রহস্যাবৃত এক অতন্দ্র মায়াবী রাত। মনে হচ্ছিল, ডানলভের পালঙ্কে শুয়ে যেন স্বর্গেই ভাসছি!

শুনলাম কান পেতে। নাঃ, সত্যিই তো, কে যেন দরজা নক্ করছে! ভাবলাম, গোয়ালা এসেছে! কিন্তু সকাল না হতেই! বিব্রোত হয়ে ক্ষীণ মৃদুস্বরে বললাম, -'কিরে মদন, ঘুম টুম নেই তোর! আজ ভোর না হতেই দুধ নিয়ে এলি যে! দিলি তো ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে!'

কিন্তু কোথায় মদন! কোনো সাড়া-শব্দ নেই! অথচ ক্ষণপূর্বেও শব্দদূষণে কানে একেবারে তালা লেগে যাচ্ছিল। হঠাৎ পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে চমকে উঠলাম ঘড়ি দেখে। -এ কি, মাত্র পৌনে পাঁচটা বাজে যে! এই অসময়ে কে এলো! তক্ষুণিই বিকট শব্দে আবার নড়ে ওঠে দরজার কড়া!
বিরক্ত হয়ে বকতে বকতে বিছানা ছেড়ে নেমে এলাম! -'কি মুশকিল! আজ এমন বিহ্যাভ্ করছে কেন মদন! ফাইজলামি করবার আর সময় পেলনা ও'! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা! দেবো আচ্ছা করে ওর কানটা মুলে!'

ইতিপূর্বেই চুড়ির ঠুন্ঠুন্ শব্দে চমকে উঠলাম আমি! বুকটা ধুক্ধুক্ করে উঠল! একেই কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছি। চোখ মেলে তাকাতেই পাচ্ছিনা! নাক কান সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গলা দিয়ে স্বরই বের হচ্ছে না! কিন্তু কার যে আবির্ভাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। জানালায় উঁকি দিয়ে ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বললাম,-'কে ওখানে?'

দরজাটা দ্রুত খুলতে যেতেই দরজার ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো মহিলা কণ্ঠস্বর! আমি থমকে দাঁড়াই! সে যেন একেবারে আহাল্লাদে ফেটে পড়ছে! সহাস্যে বলছে,-‘এ্যাই, আমিরে আমি, শ্রাবণী, শীগ্‌গির দরজা খোল! দ্যাখ্ কাকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে!’

শ্রাবণী, পড়ে গেলাম বিস্ময়ের ঘোরে! নামটা তো খুবই চেনা চেনা লাগছে! অথচ মনেই করতে পাচ্ছি না কিছুতেই, কে এই মহিলা! কেন এসেছে! ওর কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে!
শেষাব্দি আমতা আমতা করে বললাম, -‘তা এই অসময়ে কেন ভাই! সঙ্গে কে এসেছে?’
ক্ষীণ বিব্রোত কণ্ঠে শ্রাবণী বলল,-‘আরে বাবা, দরজাটা আগে খোল তো, ভীষণ ঠান্ডা লাগছে বাইরে!’

হঠাৎ অসময়ে বিনা নোটিশে অচেনা মহিলার আগমনে অস্বস্তিবোধ করি মনে মনে! কিঞ্চিৎ গড়িমশি করে বললাম,-‘না খুলবো না! আগে বল, সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছিস!’

অসন্তোষ গলায় শ্রাবণী বলল, -‘ন্যাকামি করিস না তো! তুই জানিস না কে! দ্বীপকেই নিয়ে এসেছি সঙ্গে! আমার সন্দীপ, ও’ আমার, আমারই থাকবে! কাউকে ছিনিয়ে নিতে দেবোনা! কেউ পারবে না আমার হৃদয় থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে! কোনদিনও না!’

হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, খুব দস্যি মেয়ে ছিল শ্রাবণী! কাউকে গ্রাহ্য করতো না! খই ফোটার মতো চোখেমুখে এক নিঃশ্বাসে কথা বলতো। যেমন একরোখা, জেদী, তেমনি বজ্জাত! কোনো জিনিসই ওর ছুঁতে পারতো না কেউ! শেয়ারও করতো না কারো সঙ্গে! সব একাই ভোগ করতো, সেই শ্রাবণী! কিন্তু তা-ইবা কেমন করে সম্ভব! সন্দীপ তো কাকে বিয়ে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল শুনেছিলাম! ওকে ও’ পেল কোথায়! আশ্চর্য্য, কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা!
সবুর সয়না শ্রাবণীর। ক্ষণিকের নীরবতায় ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। বিব্রোত হয়ে খুব জোড়ে ধাক্কা দিতে লাগল দরজায়!-‘ওঃ হোঃ, বলছি না দরজাটা খুলতে! করছিস কি তুই এতক্ষণ!’ বলেই খিলখিল্ করে হেসে ওঠে শ্রাবণী।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। রুদ্ধ হয়ে গেল আমার কণ্ঠস্বর। অভিভূতের মতো হাঁ করে থাকি! বিশ্বাসই করতে পাচ্ছিনা নিজের কানদু’টোকে! ফূর্তিতে মন-প্রাণ যেন একেবারে টববগ করছে ওর! খুশীর প্লাবনে হৃদয়ের দুকুল যেন ভেসে যাচ্ছে! বলে কি শ্রাবণী! আর ওইবা এতকাল পর আজ এলো কোত্থেকে!

চকিতে একটুকরো বেদনাময় স্মৃতির তীব্র জাগরণে মনটা আমার উদাস হয়ে গেল! আমি হারিয়ে গেলাম কল্পনায়। ধীরে ধীরে মনঃশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হতে লাগল, পাথরের মূর্তির মতো বোধশক্তিহীন শ্রাবণীর সেই বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানা।

(দুই)

শ্রাবণী ছিল অসাধারণ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী এক উদ্বিগ্ন যৌবনা অনন্যা। লম্বা ঘনকালো রেশমী চুল। তিখালো নাক! দুইভ্রুর মাঝখানে ঝুলে থাকতো একগোছা কোঁকড়ানো চুল। মায়াবী চোখের চাহনি! ঠোঁটের বাঁদিকে কালো একটা তিল! শ্বেতাঙ্গদের মতো দুধসাদা গায়ের রঙ! অথচ কি মসৃণ, কোমল! যাকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে নজর ফেরায় কার সাধ্য! বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান প্রতিটি মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো। যেমন প্রজাপতির মতো প্রাণবন্ত চঞ্চল তেমনি ওর ঠোঁটের কোণে তরতাজা হাসির একটা রেখা সর্বদা লেগে থাকতো! এমনিতেই হাসির একটা ছোঁয়াচে রোগ ছিল ওর! কাউকে হাসতে দেখলে কি রগড়টাই না করতো! নিজেও হাসতো আর পাঁচজনকেও হাসাতো! কিন্তু ওর এই বেলেল্লাপণা একদম পছন্দ করতেন না মা রেনুবালা! তিনি ছিলেন সেকেলে মহিলা। তার সংস্কারপ্রবণ মন-মানসিকতা! উঠতে বসতে আপত্তি, অভিযোগ! মন্ত্রের মতো সারাক্ষণ রান্নাঘরে বসে বসে গজ্‌গজ্‌ করতেন! অথচ কৈশোরের দৌড়-ঝাঁপ পেরিয়ে যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেই সম্পূর্ণ বদলে গেল শ্রাবণী! কিন্তু ওর মন পাখীটা কখন যে পাড়ার নবাগত হ্যান্ড্‌সাম সন্দীপের হৃদয়দ্বারে উড়ে গিয়ে বসলো, তা নিজেও টের পেলনা শ্রাবণী!

সেবার কাল-বৈশাখীর প্রচন্ড ঝড়ে পাড়ার মুখুজ্জ্যে জ্যোঠার গাছের আমগুলিসব ঝোরে গিয়েছিল! আর ঝড় থামতেই পাড়ার ছেলে-মেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে ছুটে যায় আম কুড়োতে! ছুটে গিয়ে ছিল শ্রাবণীও! যেদিন উজ্জ্বল সুঠাম সুদর্শণ সন্দীপের পুরুষোচিত চেহারা এবং মিশ্রব্যক্তিত্বের এক মুগ্ধ আকর্ষণে ওকে বেশ কিছুক্ষণ বুদ করে রেখেছিল! আর সেইদিনই অপ্রত্যাশিত প্রেমের পত্তনে শ্রাবণীর হৃদয়পটভূমিতে প্রচন্ড আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল! যেদিন ভালোবাসার বীজ রোপন করতে প্রচন্ডভাবে ওকে উদ্বুদ্ধ করেছিল! যেদিন মনমন্দিরে স্থাপণ করেছিল, ওর জীবন দেবতার আসন! যার আধিপত্য ছিল শুধুমাত্র সন্দীপের! যা কেউই জানতো না!

প্রতিদিন কলেজ শেষে ফিরতি পথে ষ্টেশনের সংলগ্ন প্রকান্ড কদমগাছের নীচে তীর্থের কাকের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকেতো সন্দীপের অপেক্ষায়! অথচ একবারও ভেবে দেখলো না, সন্দীপের হৃদয়ের গভীরে কখনো পৌঁছাতে পারবে কি না! কখনো ওর নাগাল পাবে কি না! কখনো ওর মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে পারবে কি না! অথচ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সন্দীপের মনের ঠিকানা কখনো খুঁজে না পেলেও ওর চোখের ভাষা সন্দীপ বুঝে নেবে, শ্রাবণীর সুকোমল হৃদয়ের উষ্ণ অনুভূতি, ওর মনের কথা। সন্দীপ একদিন আকৃষ্ট হবেই ওর প্রতি! ওর প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়বেই! শ্রাবণী কোনদিন হার মানেনি! আজও মানবে না! হার মানতে শেখেনি শ্রাবণী!

একদিন পড়ন্ত বিকেলে স্নিগ্ধ হাওয়ায় ছাদের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শ্রাবণী! গুন গুন করে আপনমনে গান গাইছিল। হঠাৎ রাস্তার মোড়ে সন্দীপকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনটা ওর অনাবিল খুশীতে ভরে ওঠে! মনে মনে বলে, -'আজ আর কিছুতেই ওকে ছাড়ছি না, এই সুবর্ণ সুযোগ! বাবু না কি মেয়েদের দিকে তাকান না! মেয়েদের সান্নিধ্যে কখনো যাননা! হুঁঃ সাধু পুরুষ! দাঁড়াও, কেমন করে বশ করতে হয়, তোমায় দেখাচ্ছি!

এই ভেবে শ্রাবণী উর্দ্ধঃশ্বাসে দৌড়ে নিচে নেমে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। ততক্ষনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়! দেখামাত্রই বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে! হৃদ্স্পন্দনও আরো দ্রুতগতীতে চলতে থাকে! -'এ কি, এত বড় বড় স্যুটকেস্ নিয়ে সন্দীপ যাচ্ছে কোথায়! ও'কি দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছে না কি! কিন্তু কেন!' চাপা আর্তনাদে স্বগতোক্তি করে উঠল শ্রাবণী।
ইচ্ছে হচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে সন্দীপকে বাঁধা দিতে। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৈফেয়ৎ চাইতে। কোথায় যাচ্ছে! কেন যাচ্ছে! ক'দিনের জন্য যাচ্ছে! কবে ফিরবে! কিন্তু সেই কৈফেয়ৎ শ্রাবণী চাইবে কেমন করে? কোন্ অধিকারে? কোন্ সূত্রে? ও' হয় কে সন্দীপের! সম্পর্ক তো দূর, আলাপ-পরিচয়ই এখনো হয়নি ওর সঙ্গে! তা'হলে!

শ্রাবণী নীরব, নির্বিকার! চাপা বেদানায় বুকের ভিতরটা বারবার মোচড় দিয়ে ওঠে! অশ্রুসিক্ত চোখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে! চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। হারিয়ে যায় মনগড়া এক স্বপ্নপুরীতে। নিজের ভিতরে যে তীব্র অনুভূতির জাগরণ, তাতে শিহরিত হয় সারাশরীর! শ্রাবণী নিজেই টের পায় তা সম্পূর্ণ এক নতুন বিস্ময়! এক অভিনব অনুভূতি। যেদিন গহীন অনুভূতি দিয়ে প্রথম অনুভব করে ছিল, সন্দীপকে সত্যিই সে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে। সন্দীপই ওর জীবনের সব। ওর হৃদয় নামক বিশাল সাম্রাজ্যের ওই একমাত্র সাম্রাজ্ঞী!

ইচ্ছে হচ্ছিল, সন্দীপের আবেগাপ্লুত প্রেমের স্পর্শ পেতে! ওর পেশীবহুল বাহুদ্বয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনে একেবারে পিষ্ঠ হয়ে যেতে! ওর হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসার আবগাহনে নিমজ্জিত হতে। ওর পুরুষালী দেহের উষ্ণ আবেগানুভূতিতে বুদ হয়ে থাকতে! কিন্তু তা পারল না। ওর সম্মুখেই চলে গেল সন্দীপ! পারেনি ওকে বাঁধা দিতে! ওর পথ অবরোধ করতে! নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে। সঁপে দিতে। পারে নি, ভালোবাসা নামে চিরসত্য ও পবিত্র শব্দটা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে। মেঘের আড়ালে সূর্য্য ডুবে যাবার মতো পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্দীপ! আর সেইদিন থেকেই মনকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করে শ্রাবণীর! অনুতাপ অনুশোচনায় হৃদয়াকাশের বুক চিরে বারবার বেদনার ঝিলিক দিতে লাগল, ও কেন পারল না, ছলা-কলায় সন্দীপকে প্রেমের ডোরে বাঁধতে। কেন পারল না, ওকে ওর মনের কথাটা জানাতে। কেন একটিবার নির্জন নিড়িবিলিতে মুখোমুখি ওর সঙ্গে দেখা হলোনা!

শুধুমাত্র সুদর্শণই নয়, সন্দীপ একজন আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মার্জিত পুরুষ! উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ভুলেও কখনো শ্রাবণীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি কোনদিন! বাড়ির আশে -পাশেও কোনদিন নজরে পড়েনি ওকে! অথচ দৃঢ় মনের অধিকারী এবং উচ্চাভিলাষী শ্রাবণী যখন যা চাইতো তা-ই হাসিল করে নিতো! সন্দীপকে ও' ঠিকই চিনেছে! ওই ওর একমাত্র উপযুক্ত পাত্র!

শ্রাবণী নিরাস হয়না! অপেক্ষা করে থাকে, ভালোবাসার যে ফুল মনের অজান্তে ফুটে গিয়েছিল, তারই মধুর সুরভী ঢেলে ওর স্বপ্নের রাজকুমার সন্দীপকে মোহিত করবে। ওকে একান্তআপন করে প্রাণের ডোরে বেঁধে নেবে! বসাবে হৃদয়ের রাজসিংহাসনে, দেবতার আসনে।

কিন্তু বিধিই বাম! শ্রাবণীর স্বপ্নের রাজকুমার সন্দীপ আর ফিরে আসেনি! রসায়ন বিজ্ঞানে ডক্টরেট করতে গিয়ে পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি উপেক্ষা করে সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির হাজার বৈষম্য লঙ্ঘন করে জীবনসঙ্গিনী রূপে বেছে নেয়, ইংলেন্ডের এক শ্বেতাঙ্গপরীকে! সেখানেই স্থায়ীভাবে গড়ে তোলে ওর ভালোবাসার রাজপ্রসাদ। যার কোনো পিছু টানই ছিলনা!
শুনে মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ে শ্রাবণীর। নিভে গেল ওর আশার প্রদীপ! শুকিয়ে গেল যৌবনের ফুল! মরে গেল বেঁচে থাকার সাধ, ভালোবাসার ইচ্ছা-আবেগ-অনুভূতি! জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত কামনা -বাসনার গলা টিপে ওর ফুলের মতো জীবনটাকে অর্থহীন করে তোলে। কোনো আনন্দ নেই! চাহিদা নেই! নেই নতুন কোনো স্বপ্ন! জীবন যার কাছে মরুভূমির মতো, অবাঞ্ছিত, নির্মোহ, তার কিইবা আর মূল্য আছে জীবনের।

কিন্তু শ্রাবণীকে বোঝাবে কে! একরোখা মেয়ে! বিরল ওর সেন্টিমেন্টাল! অনমনীয় তার জেদ। মন্ত্রের মতো সারাক্ষণ জপতো, -'আলোবাসার যে ফুল না ফুটতেই ঝড়ে যায়, দেবতার চরনেই যদি ঠাঁই না পায়, সে ফুল ফুটেইবা আর লাভ কি! কি হবে তাকে বাঁচিয়ে রেখে! কে দেখবে তার সৌন্দর্য্যের বাহার! কেইবা নেবে তার সুমধুর সুবাস! জীবনে এত বড় পরাজয়! পরাজয়ের এত গ্লানি!'

শ্রাবণী পারেনি মেনে নিতে! পারেনি পরাজয়ের গ্লানি নির্বিকারে সহ্য করতে! সন্দীপকে না পাওয়ার ব্যর্থতায় ক্ষোভে, দুঃখে অভিমানে নির্বাসিত জীবনকে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়ে বদ্ধ ঘরের কোণে আহত পাখীর মতো পড়ে থাকে, জীবনের অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষায়!

(তিন)

হঠাৎ শ্রাবণীর বজ্র কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গল। -'ওফ্ঃ হোঃ, কি হলো রে, বলছি না দরজাটা একটু খুলতে!'

থতমত খেয়ে দরজাটা দ্রুত খুলতেই বিদ্যুতের শখের মতো শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিতে যেন একটা ঝটকা লাগল আমার! -এ কি, শ্রাবণীর আজ এ বেশ কেন! মাথায় ঘোমটা দিয়ে, হাতে গলায় গহনা পড়ে একেবারে কনে সেজে এসেছে যে!

শ্রাবনীর পড়নে ছিল, লাল চওড়া পাড়ের কালো রংএর শাড়ি। কপালে বড় একটা লাল টিপ। বাতাসে ভাসছে আতরের তীব্র গন্ধ! আবছা ক্ষীণ অন্ধকারে মুখখানা স্পষ্ট দেখা না গেলেও মুক্তোর মতো দাঁতগুলিকে ওর কেমন অদ্ভুত লাগছিল দেখতে! আবার পরক্ষণেই মনে হলো, শ্রাবণীর আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা! শরীরের অগ্র-পশ্চাৎই বোঝা যাচ্ছে না ওর!

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমার! অজানা বিভীষিকায় বুকটা ধুক্‌ধুক্ করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত শ্রাবণীর আগমনে এবং ওর অভাবনীয় বিবর্তন রূপের দর্শণে পড়ে গেলাম বিস্ময়ের ঘোরে! আশ্চর্য্য,

ক'দিন আগেও তো ওর উঠে দাঁড়াবারই ক্ষমতা ছিলনা! গলা দিয়ে আওয়াজই বের হচ্ছিল না! অচৈতন্য অবস্থায় আহত পাখীর মতো পড়েছিল বিছানায়! অথচ আজ পায়ে হেঁটে, এতখানি মেঠোপথ পেরিয়ে শ্রাবণী এলো কিভাবে! সম্ভবই বা হলো কি করে! এ তো বিশ্বাস যোগ্য নয়! কিন্তু সঙ্গে তো কাউকেই দেখছি না! সন্দীপকে নিয়ে এসেছে বলল, কোথায় গেল ও'?

আমি স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি।

শ্রাবণী বলল, -'এতো কি ভাবছিস বলতো! আমায় নতুন দেখছিস না কি! চল্ আমার সঙ্গে!'
লক্ষ্য করলাম, শ্রাবণী কথা বলছে ঠিকই অথচ ওর মুখই দেখা যাচ্ছেনা। হঠাৎ অনুভূত হলো, কে যেন জোরে ধাক্কা দিলো আমায়। আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, কোনরকমে সামলে নিলাম! একটা ঢোক গিলে বললাম, -'কি রে শ্রাবনী, তুই! কি ব্যাপার! কোথায় গেল তোর সন্দীপ?'

ঘোমটার আড়াল থেকে কাতর কণ্ঠে খুব অনুনয় বিনয় করে শ্রাবণী বলল,-'এ্যাই, মুখুজ্জ্যে জ্যাঠার আমবাগানে যাবি! কতকাল হয়ে গেল যাইনি! যাবি আমার সঙ্গে! চল্ না, ঘুরে আসি গিয়ে!'
শ্রাবণীর কথা শুনে পড়ে গেলাম সংকটে। বললাম, -'বলিস কি রে, সে তো অনেক দূর! দুই-তিনটে শাঁকো পেরিয়ে যেতে হবে ধানক্ষেতের গা-ঘেষা কাদামাটির রাস্তা ধরে! তাও এই অসময়ে! এখনো তো সকালই হয়নি!'

ম্লান হেসে বললাম,-'তা'ছাড়া গাছে এখন আম কোথায়! অঙ্কুরই তো বের হয়নি! গিয়ে করবি কি, শুনি! কিন্তু আজ এতকাল পর হঠাৎ পুরোনো অভ্যাস মাথা চারা দিয়ে উঠল কেন তোর! এ বয়সে আমাদের কি সাজে এইসব! লোকে দেখলে কি বলবে বলতো! বলবে, বুড়িধারী দু'টোর ভীমরতি ধরেছে! এখনো ছেলেমানুষিই গেল না ওদের!'

গম্ভীর হয়ে শ্রাবণী বলল,-'আরে সেই জন্যই তো এলাম এখন! কেউ দেখবে না, শীগ্গির চল্! আজ ও'ও আসবে! দেখা হবে ওর সঙ্গে!'

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, -'ও' আসবে মানে, কে আসবে! তোর সন্দীপ গেল কোথায়?'

শ্রাবণী নাছোরবান্দা! কোনো কৈফেয়ৎ দিতে রাজি নয়! যেতেই হবে ওর সঙ্গে! তখনো দিগন্তের প্রান্তেউষার প্রথম সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোর রক্তিমাভা এসে পৌঁছাতে অনেক দেরী! চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ! দূর থেকে ভেসে আসছে, শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা নিঃশব্দে পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছে, দূর নীলিমায়! আকাশের তারাগুলিও ক্ষীণ মৃদু আলোয় মিটি মিটি করে জ্বলছে তখনও। মনে হচ্ছিল, যেন সাদা মেঘের সঙ্গে ওরা লুকোচুরি খেলছে।

অগত্যা শ্রাবণীর একান্ত পীড়াপীড়িতেই তখনি বেরিয়ে পড়তে হলো। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল শ্রাবণীর। কোনদিকে তাকাচ্ছে না! হাঁটছে তো হাঁটছেই! বললাম, -'কি রে শ্রাবণী, হঠাৎ চুপ হয়ে গেলি যে! কথা বলছিস না কেন!'

মুখখানা আড়াল করেই শ্রাবণী বলল, -'আজ একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাবো তোকে! এখান থেকে অনেক দূরে!' বলেই আমায় পিছনে ফেলে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

বললাম, - 'সে কি রে! মুখুজ্জ্যে জ্যাঠার আমবাগানে যাবি বললি যে!'

কিছুক্ষণ থেমে শ্রাবণী বলল,-'সেখানেই তো যাচ্ছি! এটা শটকার্ট রাস্তা ধরে যাচ্ছি! তাড়াতাড়ি হাঁট!' বলতে বলতে বাঁশঝাড়ে ঢুকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল শ্রাবণী! ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার! তাকাই এদিক ওদিক, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা। গা-টা ভার হয়ে গেল! বুকটা ধুক্‌ধুক্ করে উঠল! ধানের শীষের মতো লম্বা গাছ-গাছালিতে ঢেকে গিয়েছে গোটা রাস্তা! বোঝা যাচ্ছে, সামনে পথ বন্ধ! চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল! লোকজন নেই কোথাও! কোনো ঘর-বাড়িও নেই আশেপাশে! হঠাৎ প্রলয়ঙ্করী বেগে শুরু হয় প্রচন্ড ঝড়! ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে, গাছের ডালপালাগুলো ভেঙ্গে মুছড়ে লেপটে পড়ছে মাটিতে। অগ্রসরই হওয়া যাচ্ছে না! ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সারাশরীর জমে হীম হয়ে যাবার জোগার আমার!

থমকে দাঁড়াতেই জঙ্গলের ভিতর থেকে শ্রাবণীর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি। -'কিরে, দাঁড়ালি কেন, আয়!'

একটা ঢোক গিলে ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বললাম,-'কোথায় আসবো বলতো, এই ঝড়-তুফানে হাঁটবি কি করে! একটু দাঁড়িয়ে গেলে হতো না! কিন্তু তুই কোথায় শ্রাবণী? তোকে দেখছি না কেন?'

হঠাৎ কোথা থেকে আর্বিভূত হয়ে শ্রাবণী বলল, -'এই তো আমি! আয় আমার সঙ্গে!'

তখন লক্ষ্য করলাম, শ্রাবণীর নগ্ন পা। ঝোঁপ-ঝাঁড় ডিঙ্গিয়ে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে! ওর হাত-পাদু'টো অস্বাভাবিক লম্বা! বড় বড় পদক্ষেপ! যার দূরত্বের ব্যবধান ছিল অনেকখানি! মুহূর্ত্যের জন্য মনে হয়ে ছিল, শ্রাবণীর পায়ের পাতাটা পিছন দিকে! শ্রাবণী লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে! হেঁটেই পাচ্ছিনা ওর সঙ্গে! অথচ তখন কল্পনাই করতে পারিনি, এ শ্রাবণী নয়! শ্রাবণীর অশরীরি প্রেতাত্মা! অথচ অন্ধের মতো সেই তখন থেকে ওকেই অনুসরণ করে যাচ্ছি! আর কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে থাকলে আমার ঘাড়েই হয়তো চেপে বসতো কিংবা ঘাড়টাই মটকে দিতো, কে জানে!

তার পরক্ষণেই দেখি, শ্রাবণী স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে, কথা বলছে। বিস্ময়ে জিজ্ঞ্যেস করলাম, -'কিরে, তোকে না এক্ষুণি নগ্ন পায়ে দেখলাম মনে হলো!'

উত্তরে গম্ভীর হয়ে শ্রাবণী বলল, -'এ্যাই, বেশী কথা বলিস না! চুপচাপ চলে আয় আমার সঙ্গে।'

হাঁটতে হাঁটতে একসময় পোঁছে গেলাম গভীর জঙ্গলে! বোঝা যাচ্ছে, এখানে জন্তু-জানোয়ারদের আড্ডা। ততক্ষণে ঝড় প্রায় থেমে গিয়েছে! রাজ্যের কীট-পতঙ্গ, ফড়িং-প্রজাপতি, পোকা-মাকড় সব উড়ে চোখেমুখে এসে পড়ছে। চারদিকে মাঁকড়শার জাল! অক্টোপাসের মতো আষ্টে-পিষ্টে ঘিরে আছে গোটা জঙ্গল। পা ফেলার জায়গা নেই! চারধারে বড় বড় কেঁচো, কাঠপিঁপড়া, শুঁয়োপোকা সব কিলবিল কিলবিল করছে! কোলাব্যাঙ কতগুলো থপ্থপ্ করে লাফাচ্ছে! কতগুলো জঙ্গলি মশা আর মাছি মাথার উপর বন্বন্ করে ঘুরছে! তাড়ানোই যাচ্ছে না!

বিরক্ত হয়ে বললাম, -'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বলতো শ্রাবণী! হাঁটবো কোনদিক দিয়ে! চারিদিকে শুধু জঙ্গল! হাঁটার রাস্তাই তো দেখছি না কোথাও!'

কিন্তু কোথায় শ্রাবনী! কোনো সাড়া শব্দ নেই ওর! পলকে উধাও হয়ে গিয়েছে! জঙ্গলের ভিতর থেকে মরা কান্নার মতো শন্শন্ শব্দে ভেসে আসছে বাতাসের গোঁঙানি! মনে হচ্ছিল, সত্যি সত্যিই কে যেন কাঁদছে! কিন্তু তখনকার পরিবেশ রীতিমতো ভৌতিকই লাগছিল! অঘোর জঙ্গল, জনশূন্য! অনবরত ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। এক একটা মুহূর্ত্য ঘড়ির কাটার মতো ঝিম্ ঝিম্ করে বয়ে চলেছে। অথচ ভোরের আলোও প্রায় ফুটে গিয়েছে তখন! আজানা আশঙ্খায় বুকটা বারবার কেঁপে উঠছে! ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ! একটা শব্দও উচ্চারিত হচ্ছেনা! আমি ভারসাম্যহীণ হয়ে পড়ি। জমে হীম হয়ে গিয়েছিল সারাশরীর। ছুটে যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবো, সে ক্ষমতাও তখন আমার ছিলনা! মিরগি রোগের মতো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে থর্থর্ করে কাঁপতে থাকি।

ইত্যবসরে গরুর বাছুর খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলে এসে পৌঁছায় মুখুজ্জ্যে জ্যাঠা। আমায় দেখে সবিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যান তিনি। চোখেমুখেও উদ্বেগ, উৎকন্ঠা। কিছুক্ষণ থেমে হঠাৎ বলে উঠলেন, -'ওলো ছ্যামড়ি, করস কি তুই এইখানে? রাম রাম রাম রাম, হেই জঙ্গলের ভিতর তুই আইলি কেম্নে? কখন আইছস্? কার লগে আইছস্?'

গলা দিয়ে তখনও আওয়াজ বের হয়না আমার! ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি হাঁ করে। মুখুজ্জ্যো জ্যোঠা আমার গায়ে জোরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললেন,-'এ্যাই ছ্যামড়ি, হইছে কি তড়! কথা কস্ না ক্যান! আইছস্ কেম্নে! আনছে কে তড়ে!'

অপ্রত্যাশিত মুখুজ্জ্যে জ্যোঠার দর্শণে হোঁশ-জ্ঞান ফিরে পেলাম! মুহূর্ত্যের জন্য মনে হয়েছিল, যেন অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে এতক্ষণে একটা কিনারা খুঁজে পেলাম! ফিরে এলাম বাস্তব পৃথিবীতে! তারও অনেকক্ষণ পর তো তো স্বরে বললাম,-'আ-আমি শ্রাবণীর সঙ্গে এসেছি জ্যোঠামশাই! ওইতো আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে এখানে!'

কপালে আঙ্গুল ঠুকতে ঠুকতে মুখুজ্জ্যে জ্যাঠা বললেন, -‘সর্বনাশ, আমিতো দেইখ্যাই ঠাহর পাইছি! ছেমড়িডায় কি করছে জানস না! মা-বাবার অন্তরে কত্তবড় আঘাত দিয়া গ্যাল গিয়া, জানস কিছু তুই!’ আমার হাত ধরে টানতে টানতে বললেন, -‘চল্ শীগ্‌গির! তোরে দেখাই শ্রাবণীরে!’

মুখুজ্জ্যের জ্যাঠার কথা শুনে আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার উপক্রম! হার্টবিটটাও আরো দ্রুতগতীতে চলতে থাকে। বলে কি জ্যাঠা মশাই! কি করেছে শ্রাবণী?

তা’হলে এতক্ষণ যে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, সঙ্গে হাঁটছিল, ও’ শ্রাবণী নয়! কিন্তু আমায় এখানে কেন নিয়ে এসেছিল ও’? কি চেয়েছিল শ্রাবণী? তবে সত্যিই কি ও’....!

পাড়ায় এসে দেখি, শ্রাবণীদের বাড়ির প্রাঙ্গনে লোকে-লোকারণ্য! অগণিত মানুষের ভীঁড়! বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েছে শ্রাবণীর শোকসন্তপ্ত মা-বাবা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন সবাই! সবার চোখে জল। আঙ্গিনার প্রাঙ্গনে সাদা কাপড়ে ঢাকা পড়ে আছে শ্রাবণীর মৃতদেহ।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সান্তনা দেবার মতো কোনো ভাষা আমার জানা ছিলনা। বাক্যাহত হয়ে পড়ি। দীর্ঘদিন শরীরের প্রতি অবহেলায় অত্যাচারে শ্রাবণী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সন্দীপকে না পাওয়ার ব্যর্থতায়, ক্ষোভে, দুঃখের যন্ত্রণায় অভিমানে নিশুতি রাতে বিষপানে আত্মাহুতি দিয়ে শান্ত হয়ে শ্রাবণী চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে!

লিখে রেখে গেছে লম্বা একখানা চিঠি! তাতে লেখা ছিল, ভালোবাসার অগ্নিকুন্ডে আমি যে জ্বলে পুড়ে একবারে ছাই হয়ে গিয়েছি দ্বীপ! তুমি কেন আর ফিরে এলেনা! কেন রামধনুর মত আমার প্রেমাকাশে দর্শণ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে! জীবনে যে শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম দ্বীপ! তোমারই প্রিয়তমা হতে চেয়েছিলাম! যে কথা তুমি জানতেও পারলে না! কেন একটিবারও আমায় জানাবার সুযোগ দিলেনা দ্বীপ! আজ যে তুমি অন্যের! অন্যের প্রাণপ্রতিম! অন্যের পূজারী! অন্যের গৃহস্বামী! এ আমি কেমন করে সহ্য করবো বলো! এ যে কত বড় যন্ত্রণাদায়ক, তা কখনো তুমি বুঝবে না দ্বীপ! আমি সহতে পাচ্ছিনা গো! তুমি কোথায় দ্বীপ! শুনতে কি পারছ আমার আর্তনাদ! এ জনমে কি আর দেখা পাবো তোমার!

আমি চললাম পরলোকে! সেখানেই দেখা হবে! তখন শুধু তুমি আমারই থাকবে! শুধু আমার! আমার প্রিয়তম হয়ে, একান্ত আপন হয়ে! আর কারো নয়! তুমি দেখে নিও, তোমার অপেক্ষাতেই পথচেয়ে থাকবো! তখন তুমি আমায় চিনতে পাববে তো দ্বীপ!

চিঠির নিচে ছোট্ট করে লেখা ছিল, আত্মঘাতী শ্রাবণী।

(চার)

হঠাৎ অনুভব করি, বিশ্বব্রম্ভান্ড জুড়ে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এলোপাথাড়ী ঝোড়ো হাওয়ায় আমার সারা শরীর দুলছে। দুলছে গাছের লতাপাতা। মেঘে ঢেকে গিয়েছে গোটা আকাশ। দিনের বেলাতেই নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। চোখে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা। সেই সঙ্গে শুরু হয় গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন। হৃদয় কাঁপানো বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক।

ক্রমাণ্বয়ে মেঘের গর্জন আর প্রবল শীততাপের শীতল অনুভূতিতে ঘুমটা আমার তখনিই সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে গেল। আমি ধড়ফড় করে উঠি! তাকাই চারিদিকে, স্বপ্ন না বাস্তব, মুহূর্ত্যের জন্য ঠাহরই করতে পাচ্ছিলাম না। ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই চোখ পাকিয়ে দেখি, কি নিরুচ্ছাস, বিষাদভরা সকাল! সূর্য্যের আলো নেই! পাখীর কলোরব নেই! ঝুপঝুপ করে অঝোরে ঝড়ছে বৃষ্টি! যেন আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি! জানালার কপাটগুলি প্রবল হাওয়ায় ঝটাং ঝটাং শব্দে অনরবত ধাক্কা খাচ্ছে। গায়ে ছিটকে এসে পড়ছে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির কণা! ঠান্ডায় হাত-পা কুঁকড়ে আমি শুয়ে আছি বিছানায়। ইতিমধ্যে ঢং ঢং শব্দে ঘড়ির ঘন্টা বেজে উঠতেই অবগত হলাম, সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বেলা এগারোটা বাজে। কিন্তু কোথোয় শ্রাবণী! কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই তো! তবে কি এতক্ষণ এসব স্বপ্ন দেখছিলাম আমি! সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া ঃ কানাডা প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।